HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৫ : খাদ্য নিরাপত্তা

টপিক – ০১ খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা
টপিক ০২: খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ
টপিক ০৩: বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি
টপিক ০৪: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ
টপিক ০৫: নিরাপদ খাদ্য
টপিক ০৬: খাদ্য নিরাপদকরণে সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও জনসাধারণের ভূমিকা
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

ভূমিকা (Introduction): ২০২০ সালে বাংলাদেশ-এর জনগণের মাথাপিছু আয় ২০০০ মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে। মার্চ ২০১৮ সময়ে জাতিসংঘ থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকও বাংলাদেশকে নিম্ন শ্রেণি হতে নিম্ন মধ্যম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে এখনও ১৮.৭ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। বাংলাদেশে এখনও ভূমিহীন জনসংখ্যা গ্রামে ৪৭.৫ ভাগ, শহরে ২৬.৯ ভাগ, জাতীয়ভাবে ৩৫.৪ ভাগ। ৪৫.১ ভাগ জনগণের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের কম। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পোৎপাদন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে একদিকে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস অপরদিকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যুগোপযোগী না হওয়ায় বিষয়টি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food Availability), খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা (Access to Food) এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্যের ব্যবহার (Food Use) বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এখনো চরম দারিদ্র্যসীমার (Hardcore Poverty) নিচে বসবাস করে এদেশের প্রায় সাড়ে নয় ভাগ মানুষ। উল্লেখিত চ্যালেঞ্জের সাথে পরিবেশগত পরিবর্তন এবং অজ্ঞতা ও অতি মুনাফার লোভে মানুষের মনুষ্যত্ব, মানবিক গুণাবলি হ্রাস পাওয়ায় বর্তমানে আরও একটি চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে-নিরাপদ খাদ্য (Safe Food) ধারণা।

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

অবাধ খাদ্য সরবরাহ এবং সারা বছর খাদ্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা। শুধু খাদ্য নয়, স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন যার ফলে মানুষের কর্মোদ্যম, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা বেশ পুরানো। প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্বে মিসরীয় ও চায়না সভ্যতায়ও এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তখনও দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কায় খাদ্য মজুদ করে রাখা হতো। গত শতাব্দীর ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা ধারণা আনুষ্ঠানিক (formal) রূপ লাভ করে। তখন হতে খাদ্য নিরাপত্তা ধারণাটি জাতীয় পর্যায়ে চিন্তার বিষয় হিসেবে বিবেচনা শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায়, পর্যাপ্ত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধি এবং খাদ্য উৎপাদন ও এর দাম স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখা।।

১৯৮৩ সালে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটিকে আরও প্রসারিত করে বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা সকল মানুষের সমগ্র জীবনের জন্য মৌলিক খাদ্য প্রাপ্তির ভৌত এবং অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তাকে নির্দেশ করে।

পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য ও ক্ষুধাসংক্রান্ত এক রিপোর্টে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপন করে বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা বলতে সকল মানুষ সমগ্র জীবনব্যাপী কার্যকর ও স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে বোঝায়।

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (USDA) এর মতে, খাদ্য নিরাপত্তার অর্থ হলো একটি পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সর্বদা পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা যাতে তারা একটি কর্মঠ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে। ধারণার প্রসারণ বিবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা পাওয়া যায় ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে। এ সম্মেলনে বলা হয়, খাদ্য নিরাপত্তা হলো এরূপ একটি বিষয় যেখানে জনগণ সবসময় ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে যা তাদের সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় জীবনের জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্মত প্রয়োজন মেটায়।

সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এই সংজ্ঞাটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক (Dimensions) হলো- (i) খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food availability), (ii) খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা (Good access), (iii) উপযোগিতা (Utilization) এবং (iv) স্থিতিশীলতা (Stability).

অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝি, নির্ভরশীল স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান যা ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

খাদ্য নিরাপত্তা দু প্রকার- গৃহগত বা পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি প্রতিটি পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহের সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল, এর মাধ্যমে পরিবারের প্রতিটি লোক সর্বদা স্বাস্থ্যবান এবং কর্মক্ষম থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য খেতে পারে। একইভাবে, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা সারা দেশের জনগণের জন্য যথেষ্ট, প্রয়োজনীয়, অবাধ এবং মানসম্মত খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য তিনটি প্রধান বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তা হলো-

ক. প্রথমত, একটি পরিবার ও গোটা জাতির প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের প্রাপ্যতা।

খ. দ্বিতীয়ত, স্থানভেদে এবং ঋতুভেদে খাদ্য সরবরাহের যুক্তিসঙ্গত স্থায়িত্ব।

গ. তৃতীয়ত, নির্বিঘ্ন এবং মানসম্মত পরিমাণ খাদ্যে প্রত্যেক পরিবারের ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবাধ অধিকারের নিশ্চয়তা।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, খাদ্যনিরাপত্তা-বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি বড় ঝুঁকি। প্রশ্ন হলো কীভাবে এই বিশ্বের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে পারি? ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে জনসংখ্যা হবে ৯ বিলিয়ন। ১ এখনও ১ বিলিয়ন লোক দৈনিক খাবার বঞ্চিত থাকে। একই সাথে পরিবর্তন হচ্ছে ভোগ অভ্যাস। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে এ পথে যাত্রা তত আশাপ্রদ নয়।

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে, আমরা অধিক খাদ্য যোগান দিতে পারি না?
সহজ উত্তর হলো, অধিক খাদ্য উৎপাদন করো। কিন্তু পুষ্টিকর বা মানসম্মত খাদ্য? চ্যালেঞ্জটি বেশ জটিল। মানুষের প্রথম মৌলিক ও মানবিক অধিকার হলো খাদ্য। আমাদের খাদ্য চাহিদা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পারিবারিক, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে নিরবচ্ছিন্ন। এজন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মজুত প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বণ্টন প্রয়োজন। সুতরাং সবচেয়ে বড় সমাধান হলো উৎপাদন বৃদ্ধি যা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ ভূমি, পানি ও প্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পদের মধ্যে-গ্রামীণ উন্নয়নই হলো খাদ্য নিরাপত্তার মূল চাবিকাঠি।
কিন্তু বাস্তবতা হলো তিন-চতুর্থাংশ দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষ গ্রামে বাস করে।
অধিকাংশ কৃষক খাদ্য উৎপাদন করে কিন্তু ঐ খাদ্য তারা গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তাদের সামর্থ্যের অভাব। এ কৃষকদের প্রয়োজন হলো স্থিতিশীল উৎপাদিকা শক্তি এবং আয় বৃদ্ধির নিশ্চিত ধারা। কিন্তু তাদের অনেক অভাব, অভাব অবকাঠামোগত উন্নয়নের, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা, সামর্থ্যের। এক্ষেত্রে দ্রুত দারিদ্র্যবিমোচনে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা এবং বিনিয়োগ সবচেয়ে শক্তিশালী বিষয়।

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

বিদ্যমান সমস্যার মধ্যে সুখবরও আছে। জ্ঞান, প্রযুক্তি, দক্ষতা ও উৎকর্ষতা লাভ করছে, এর সাথে আর্থিক সম্পদ প্রবাহ স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে। অধিক খাদ্য উৎপাদনও হতে পারে, তা হলে যার প্রয়োজন সে খাদ্য পাবে। কৃষি একটি সঞ্জীবনী বিজ্ঞান (Vital Science). হাজার বছর ধরে কৃষিতে উদ্ভাবনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতেও কৃষি উৎপাদনে বিভিন্নতা, ভিন্নতা, বৈচিত্র্য এসেছে এই কৃষকদের হাত ধরে। ৫০০০ বছর পূর্বেও পোকা-মাকড় (insects) দমনে সালফার এর ব্যবহার হয়েছে এবং শত বছর যাবৎ বিভিন্ন ফ্যাংগাল (ছত্রাক) রোগ দূরীকরণে কপার-এর ব্যবহার হচ্ছে।" এ সকল জ্ঞান আজকের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে ব্যবহার হচ্ছে। বিশ্বের কৃষিব্যবস্থা চাহিদা সৃষ্টি করছে-কৃষি বৈচিত্র্যের, শস্যের, জনপদের, সম্পদের এবং সংস্কৃতির। উন্নত জ্ঞান কৃষকদের উৎপাদনশীলতা, আর্থিক নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা সুসংহত (Sustainable) করবে। এসব কারণে কৃষিতে অধিক বিনিয়োগ হচ্ছে, যা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজন মেটাতে ভূমিকা রাখবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৫ : খাদ্য নিরাপত্তা

টপিক – ০২ খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

খাদ্য নিরাপত্তা দারিদ্র্য দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শুধু খাদ্য নয়, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য। বিভিন্ন পর্যায়ে নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের ফলে গত দশকে তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন আসে।
ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ অপেক্ষা এশিয়া ও আফ্রিকার শিশুসহ সকল মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার দিকসমূহ ঝুঁকিবহুল। ১৯৪০-৫০, এ সময়ে সকল অঞ্চলের মানুষের খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল। তখন এ ধারণা ছিল, Secure, adequate and suitable supply of food for everyone. তা গ্রহণযোগ্য ছিল আন্তর্জাতিকভাবে, দ্বি-পক্ষীয় ও বহু পক্ষীয় সংস্থাসমূহ তথা দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ কর্তৃক 'বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)'র পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৯৬০ সালের দিকে সম্পদশালী দেশসমূহ উন্নয়নের জন্য খাদ্য সাহায্যকে শর্ত হিসেবে ব্যবহার করেছে যা WFP ১৯৬৩ সালে চালু করে। নাটকীয়ভাবে, ১৯৭২-৭৪ সময়ে দাতা দেশসমূহের খাদ্যের যোগান এবং দামের মধ্যে অভারসাম্য বা অস্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬০ সালে সবুজ বিপ্লবের ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তখন খাদ্য নিরাপত্তা ধারণা কাঠামোগত রূপ পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রসারিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৯০ এর দিকে ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

টপিক ভিত্তিক
একাডেমিক কোর্স

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

Dimensions of Food Security : খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ :
প্রবাহ চিত্র : ১

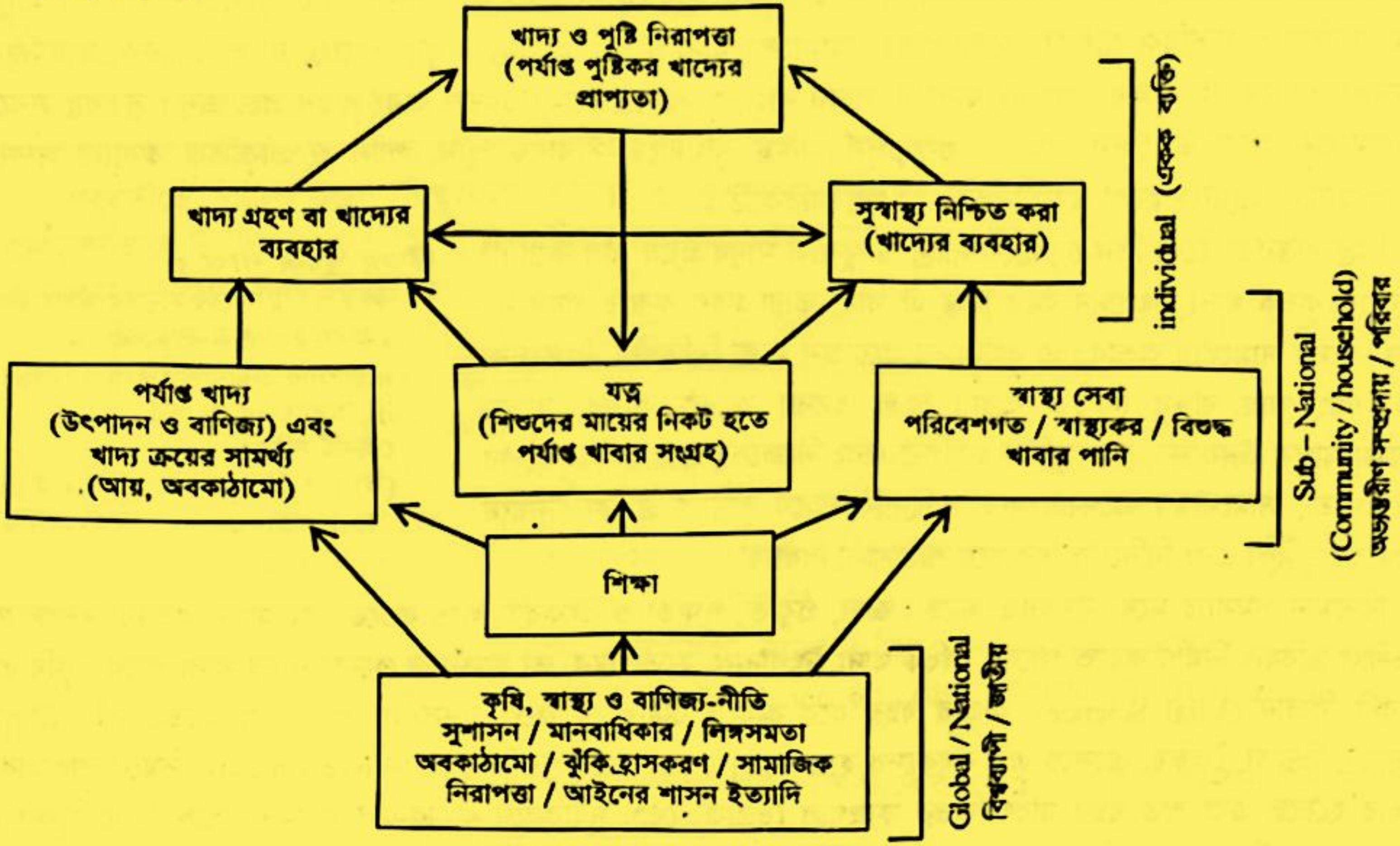

Source : Modified after UNICEF 1998
UNICEF : 1998 : The State of the World Children, Focus on Nutrition

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

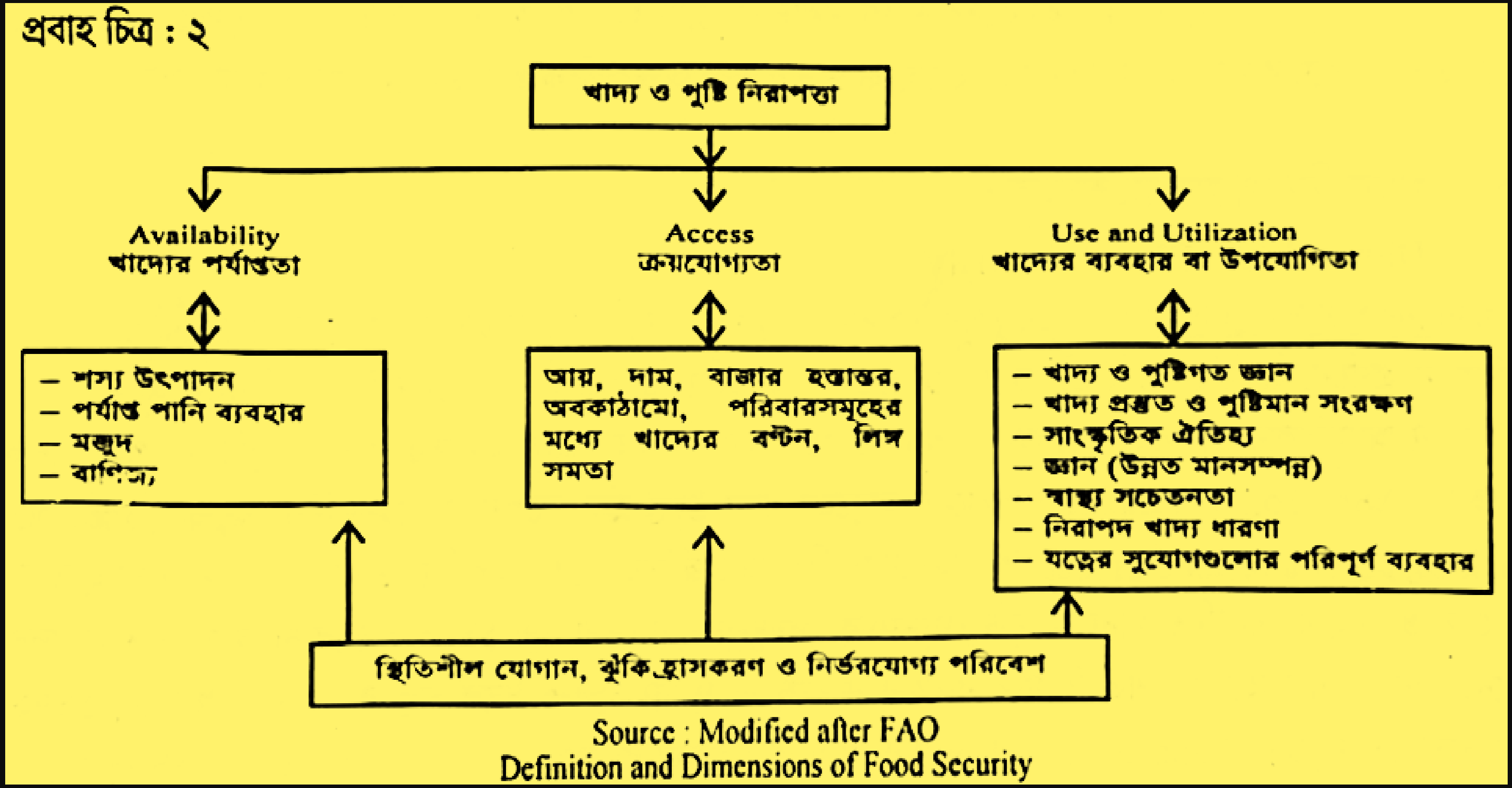

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

প্রবাহ চিত্র : ৩

Food Security : Components & Key Elements

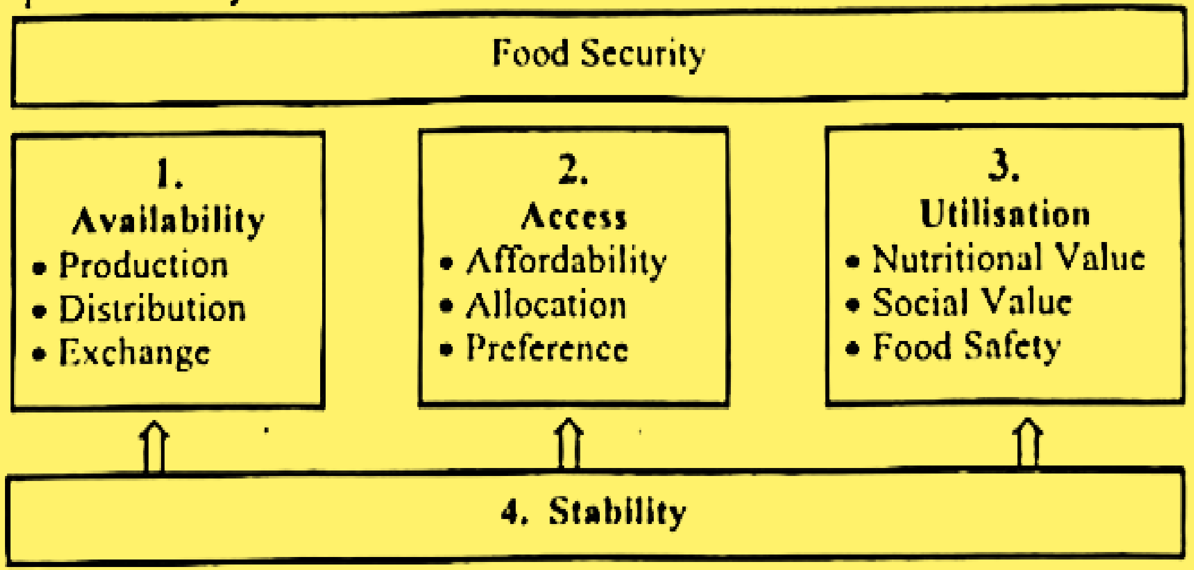

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

উপরে উল্লেখিত প্রবাহ চিত্রের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা বা পর্যাপ্ততা (Food availability)
খ. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা (Food accessibility) এবং
গ. খাদ্যের উপযোগিতা বা ব্যবহার (Food Use)

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা বা পর্যাপ্ততা (availability) অর্জন করা যাবে যদি পর্যাপ্ত খাদ্য উদ্বৃত্ত হিসেবে থাকে, খাদ্যের চাহিদা অপেক্ষা যোগান বা উৎপাদন যদি অধিক হয়। অর্থাৎ খাদ্যের প্রাপ্যতা বলতে ব্যক্তি ও পরিবারের চাহিদার প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তিকে নির্দেশ করে। FAO এ সম্পর্কে বলেন, The availability of sufficient quantities of food of appropriate quantity, supplied through domestic production or imports (including food aid).*"

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে এটি অর্জন করা যায় কারণ ঐ সকল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নগণ্য; ভূমি, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, আর্থিক সামর্থ্য পর্যাপ্ত, প্রযুক্তি উচ্চ মানসম্পন্ন, দক্ষতায় শীর্ষে। কিন্তু বাংলাদেশসহ এশিয়ার জনবহুল দেশসমূহ, আফ্রিকায় যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অপ্রতিরোধ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সামর্থ্য অত্যন্ত স্বল্প, প্রযুক্তি ও দক্ষতা নিম্নমান সম্পন্ন, সেখানে খাদ্যের প্রাপ্যতা পর্যাপ্ত নয়। এ সকল অঞ্চলের অনেক মানুষ, শিশু দৈনিক দুবেলা খাবার পায় না, মানসম্পন্ন, পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান এদের জন্য অনেক দূরের স্বপ্ন।

বাংলাদেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে। জৈব প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগে কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি খাদ্য আমদানি বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন পূরণে প্রতি বছর প্রচুর খাদ্য আমদানি করতে হয়।

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রবাহ

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	১৯৮০/৮১	১৯৮৪/৮৫	১৯৯০/৯১	১৯৯৪/৯৫	২০০৪/০৫	২০০৮/০৯	২০১০/১১	২০২২/২৩	২০২৩/২৪
মোট চাল	১৩৮.৮	১৪৬.২	১৭৮.৬	১৬৮.৩	২৫১.৫৭	৩১৩.১৭	৩৩৫.৪১	৩৯১.০২	৪৩৪.২২
গম	১০.৯	১৪.৮	১০.০	১২.৫	গম : ৯.৭৬ ভুট্টা : ৩.৫৬	গম : ৮.৪৯ ভুট্টা : ৭.৩০	গম : ৯.৭২ ভুট্টা : ১৫.৫২	গম : ১১.৭১ ভুট্টা : ৬৪.৩২	গম : ১২.২৯ ভুট্টা : ৬৬.৯৫
মোট	১৪৯.৭	১৬১.০	১৮৮.৬	১৮০.৮	২৬৪.৮৯	৩২৮.৯৬	৩৬০.৬৫	৪৬৭.০৪	৫১৩.৪৫

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪

উপরের তথ্য হতে দেখা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও ১৯৮০/৮১ সালের তুলনায় বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিন গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমদানিও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: ১৯৯৫/৯৬ সালে সরকারি ও বেসরকারিভাবে সার্বিক মোট খাদ্যশস্য আমদানি ২৪.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সার্বিকভাবে মোট খাদ্যশস্য (চাল ০ লক্ষ মে. টন এবং গম ৩৭.৪৯ লক্ষ মে. টন) আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৭.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা অভ্যন্তরীণভাবে অনেক বৃদ্ধি পেলেও এখনও পর্যাপ্ত নয়।

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

খাদ্যের প্রাপ্যতা নির্ধারক উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খাদ্যের প্রাপ্যতা নিম্নোক্ত পাঁচটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। যেমন-

(i) মোট দেশজ উৎপাদন: কোনো দেশের মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে দেশের জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সহজলভ্য কৃষি উপকরণ, ভর্তুকি প্রদান, খাদ্য ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারের অংশগ্রহণ, পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা, অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতির ওপর মোট দেশজ উৎপাদন নির্ভর করে। অধিক উৎপাদন খাদ্যের প্রাপ্যতার ঝুঁকি হ্রাস করে।

(ii) মজুদ : দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে অন্যান্য দেশেও মোট খাদ্যের মজুদের ওপর কোনো দেশের খাদ্যের প্রাপ্যতা নির্ভর করে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে খাদ্যের মজুদ অধিক হলে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পায়, খাদ্য প্রাপ্তি তুলনামূলকভাবে সস্তা ও সহজ হয়।

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

(iii) নিট আমদানি: অভ্যন্তরীণ উৎপাদন স্বল্পতার কারণে বা চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কোনো দেশের নিট খাদ্য আমদানি অধিক হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা বা যোগান বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে সরকার যেকোনো পণ্যদ্রব্যের ঘাটতির সম্ভাবনা থাকলে Trading Corporation of Bangladesh (TCB) এর মাধ্যমে পণ্য আমদানি করে থাকে।

(iv) বৈদেশিক সাহায্য: দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সময় বিদেশ হতে খাদ্য সাহায্য অধিক প্রাপ্তির ফলে খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়।

(v) নিট বৈদেশিক বাণিজ্য: কোনো দেশের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়, বিনিয়োগ এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিট বৈদেশিক বাণিজ্য খাদ্যের প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। কারণ এ সকল দেশে বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় লেগেই থাকে, তাই খাদ্য সংকটের আশঙ্কাও এক্ষেত্রে বিদ্যমান।

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

খ. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা (Food access)*7 তখনই নিশ্চিত হবে, যখন প্রতিটি পরিবার বা ব্যক্তির পর্যাপ্ত সম্পদ থাকবে, প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান করতে পারবে। তবে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ ব্যক্তি বা পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না যদি না জনগণের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকে। যেসব দরিদ্র প্রান্তিক মানুষ দিনে এনে দিনে খায় পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। কারণ বিভিন্ন অনিশ্চিত অবস্থার কারণে মানসম্পন্ন খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা (Access to Food) তাদের থাকে না। যেমন:

(i) উৎপাদনের জন্য নিজেদের জমির স্বল্পতা, (ii) ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বঞ্চিত, (iii) খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি, (iv) সরকারি-বেসরকারি সাহায্যের অভাব এবং (v) জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের স্বল্পতা ইত্যাদি উপাদানগুলো প্রান্তিক বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতাকে প্রভাবিত করে।

FAO এ সম্পর্কে বলেন, Access by individuals to adequate resources for acquiring appropriate foods for a nutritious diet.**

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

উন্নত বিশ্বের জনগণের যেখানে মানসম্পন্ন খাবার উদ্বৃত্ত থাকে সেখানে বাংলাদেশের জনগণ সর্বনিম্ন দৈনিক জনপ্রতি ১৮০৫ কিলোক্যালরি খাবার সংস্থান করতে পারে না। অথচ দৈনিক জনপ্রতি ২১২২ কিলোক্যালরির অধিক খাবার প্রয়োজন।

OECD এবং FAO গত ১০ জুলাই ২০১৭ 'অ্যাগ্রিকালচারাল আউটলুক ২০১৬-২৬' প্রতিবেদনে মহাসচিব অ্যাঞ্জেল গুরিয়া বলেন, আগামী এক দশকে বৈশ্বিক খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়বে, ২৬ সালে বৈশ্বিক ভোগ বাড়বে ১৩ শতাংশ এবং বেশির ভাগ কৃষিজাত পণ্য ও মাছের প্রকৃত মূল্য কমবে। তবে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বাজারের মূল প্রবণতাকে যেন বিচ্যুত করতে না পারে, সেজন্য সরকারগুলোর একযোগে কাজ করা উচিত। ২০২৬ সাল নাগাদ চালের উৎপাদন প্রায় ২ কোটি টন; ইন্দোনেশিয়ায় ৭০ লাখ টন, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে ৬০ লাখ টন করে, ভিয়েতনামে ৪০ লাখ টন এবং চীনে ৩৫ লাখ টন বাড়বে।

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

বাংলাদেশে ক্যালরি গ্রহণভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্র্যের ধরন		১৯৮১/৮২	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৮/৮৯	১৯৯১/৯২	২০১০/১১	২০২২/২৩*
দারিদ্র্য	পল্লি	৭৩.৮	৫৭.০	৫১.০	৪৮.০	৪৭.৮	৩৫.২০	১৮.৭
	শহর	৬৬.০	৬৬.০	৫৬.০	৪৭.৬	৪৬.৭	২১.৩০	
চরম দারিদ্র্য	পল্লি	৫২.২	৩৮.০	২২.০	২৮.৬	২৮.৩	২১.১	৫.৬
	শহর	৩০.৭	৩৫.০	১৯.০	২৬.৪	২৬.২	৭.৭০	

খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুযায়ী দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বসীমা বাংলাদেশে জাতীয় ভিত্তিতে এখনও ১৮.৭ শতাংশ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা: ২০২২ সালে দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৮.৭শতাংশ মানুষ এখনো দরিদ্র এবং ৫.৬ শতাংশ মানুষ অতিদরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে এখনো এক-পঞ্চমাংশ জনগণ খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে বলতে হয়, জনবহুল, শ্রমবহুল
এদেশের জনগণের স্বল্প মজুরি, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব, দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণগুলো দায়ী। ২০২০ সালের কোভিড-১৯ এবং এর থেকে উত্তরণকালে ২০২২ এর ২৪ ফেব্রুয়ারি হতে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর সমগ্র বিশ্বে খাদ্যপণ্যের সংকট দেখা দেয়। খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় যা অনেক নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা অর্জন-Access to food/Ability to Purchase

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়; খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতা বা ক্রয়যোগ্যতাও সৃষ্টি করা আবশ্যক। লক্ষ্য করা যায়, কোথাও-কোথাও পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত খাদ্যের যোগান থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক সেখানে অনাহারে-অপুষ্টিতে ভুগছে। এ সমস্যা সমাধানে করণীয় হলো-

ক. কৃষিপ্রধান দেশসমূহের এ খাতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব এবং মৌসুমি বেকারত্ব দূর করা।

খ. কৃষির আধুনিকীকরণ এবং শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া।

গ. দারিদ্র্য প্রবল এলাকাতে কাজের সুযোগ সৃষ্টি, বিভিন্ন আয়বর্ধনকারী কর্মকাণ্ড জোরদারকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রসার ও শক্তিশালীকরণ, দরিদ্রদের জন্য কর্মোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ।

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন, বাজারব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ সাল হতে সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন-(i) অসহায়-দরিদ্র জনগণকে বিনামূল্যে খাদ্য সাহায্য, (ii) প্রাকৃতিক দুর্যোগ-উত্তর খাদ্য সাহায্য নিশ্চিত করা, (iii) খোলাবাজারে স্বল্পমূল্যে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রি করা এবং (iv) খাদ্যের বিনিময়ে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।

গ. খাদ্যের উপযোগিতা বা ব্যবহার (Food Use or Utilization) বা খাদ্যের উপযোগিতা বলতে মানুষের শরীরের সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং হজমের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ খাদ্যের ব্যবহার বলতে খাদ্যের গুণগতমান বজায় রেখে প্রয়োজনমতো সুষম খাদ্যগ্রহণ যার মাধ্যমে যথাযথ পুষ্টি লাভ হয়। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত তা হলো সুষম খাদ্যগ্রহণ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। FAO এ সম্পর্কে বলেন, Utilization of food through adequate diet, clean water, sanitation and health care to reach a state of nutritional well-being where all physiological needs are met.**

অনেকে এ ধারণাকে ভিন্ন অর্থে বোঝান। কেউ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে, পুষ্টির পরিমাণ এবং মাত্রা, বাণিজ্যিক ব্যবহার বা পুনঃবিক্রয় অথবা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য তালিকানুযায়ী খাদ্য গ্রহণকে নির্দেশ করে। সামর্থ্য খাদ্য ও পুষ্টি সুস্বাস্থ্য কর্মক্ষমতা অর্জন দারিদ্র্যবিমোচনের ওপর খাদ্যের ব্যবহার অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ যারা সচ্ছল ও উচ্চবিত্ত পরিবার তারা সঠিক খাদ্য বা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। সামর্থ্যবান পরিবার বাড়লে খাদ্যের ব্যবহার বাড়বে। কেউ যদি জানতে চায়, মানুষের দেহে খাদ্যের ব্যবহার কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন? সহজ ভাষায় বলা যায়, পুষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ খাদ্যকে কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে। খাদ্য মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। যেমন-

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

(a) দেহের বৃদ্ধি সাধন: খাদ্য দেহের বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে। জন্মের পর থেকে প্রায় ২৫ বছর পর্যন্ত সময়ে প্রোটিন জাতীয় খাবার এ কাজে সহায়তা করে। প্রোটিনের অভাবে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ওজন কমে যায়, মেজাজ খিটখিটে হয়, চামড়া খসখসে ও চুলের রঙের পরিবর্তন ঘটে এবং ১-৩ বছরের শিশুদের এর অভাবে কোয়াশিয়রকর ও প্যারাসমাস রোগ দেখা দেয়। বিবিএস ও ইউনিসেফের জরিপে। প্রকাশিত হয় খোদ সিটি করপোরেশন এলাকায় বস্তির শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি খারাপ। যেমন:

	খর্বকায় শিশু	কম ওজনের শিশু (৫ বছরের কম বয়সি)	রোগা শিশু	স্থূলকায় শিশু
বস্তি এলাকা	৪০%	৩১%	১২%	৩%
সাধারণ এলাকা	২৫%	১৮%	৭%	৪%

অপুষ্টির কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতি সাত হাজার কোটি টাকা। *2 জাতিসংঘের 'বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি-২০২২' প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশে ২০১৯-২১ সময়কালে দেশের ১১.৪% মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ১০% কৃশকায় এবং ৩০% শিশু খর্বকায়। অর্থাৎ এরা তীব্র অপুষ্টির শিকার। 'ও উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এটি একটি অন্যতম বাধা।

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

(b) দেহের ক্ষয়পূরণ: প্রতিদিনই আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এ ক্ষয়পূরণের কাজটিও খাদ্যের সাহায্যে ঘটে। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যই ক্ষয়পূরণের কাজটি করে থাকে।

(c) শক্তি উৎপাদন: আমরা বেঁচে থাকার জন্য ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি জাতীয় খাদ্য থেকে আমরা শক্তি পাই। এ খাদ্যের অভাব হলে শরীর দুর্বল হয়, কাজের ক্ষমতা কমে যায়, শরীর ক্ষয় হয় এবং ওজন কমে যায়। সুতরাং শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য খাদ্যই প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

(d) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত প্রধানত ধাতব লবণ, ভিটামিন এবং প্রোটিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে দেহকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ভিটামিন ও ধাতব লবণের অভাব হলে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগের সৃষ্টি হয়।

(c) দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ: দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে দেহকে সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম রাখা খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম ও হরমোন সৃষ্টি দেহের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রেখে শরীরে স্বাভাবিক ক্রিয়া সচল রাখার জন্য খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং খাদ্যের ব্যবহার বহুবিধ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

স্থিতিশীলতা (Stability): স্থিতিশীলতা অর্জনও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য ক্রয়ে বা সংগ্রহে নিশ্চিতভাবে সমর্থ (Capable) এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে (Continuous) প্রাপ্তি বা সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণে গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াকে বোঝায়। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে এটি একটি বড় সমস্যা হলেও ধনী দেশেও এ সমস্যা রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে অনেক দরিদ্র লোক যেমন তিনবেলা প্রয়োজনীয় খাবার সংস্থান করতে পারে না তেমনি ধনী সমাজেও অনেকে এরূপ অভুক্ত থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৫ : খাদ্য নিরাপত্তা

টপিক – ০৩ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি

ক্ষুধা দূর করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছে বাংলাদেশ। তবে অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অগ্রগতি ধীর। বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক প্রতিবেদন-২০২২ অনুযায়ী ১২১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। তালিকায় ভারত ১০১ ও পাকিস্তান ৯২তম।

বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে (২০২২)** বিশ্বের ১১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮০তম। ২০১২ সাল থেকে EIU তিনটি ক্যাটাগরি বিবেচনা করে GFSI প্রকাশ করছে। ক্যাটাগরিগুলো হলো- (ক) খাদ্য সামর্থ্য, (খ) প্রাপ্যতা এবং (গ) গুণগতমান ও সুরক্ষা। এ বছর চতুর্থ ক্যাটাগরি হিসেবে 'প্রাকৃতিক সম্পদ ও জলবায়ু অভিযোজন' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তায় বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশ হলো- (ক) ফিনল্যান্ড, (খ) আয়ারল্যান্ড, (গ) নেদারল্যান্ড, (ঘ) অস্ট্রিয়া ও (ঙ) চেক প্রজাতন্ত্র। সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকা পাঁচ দেশ হলো- (ক) ইয়েমেন, (খ) সুদান, (গ) জাম্বিয়া, (ঘ) মালাউয়ি ও (ঙ) সিয়েরা লিওন।

১৯৯৬ সালে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে বলা হয়, খাদ্য নিরাপত্তা হলো এরূপ একটি অবস্থা যেখানে জনগণ সবসময় ভৌত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে যা তাদের সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় জীবনের জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্মত প্রয়োজন মেটায়।

'Food security as the state in which people at all times have physical, social and economic access to sufficient and nutritious food that meets their dietary needs for a healthy and active life.

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি

বিগত তিনদশকে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে খাদ্যসংস্থান করার তাড়নায় পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন বেশির ভাগই উপেক্ষিত রয়েছে। পুষ্টিহীনতার কারণে ৫ বছরের কম বয়সী প্রতি ১০০০ জন জীবিত শিশুর মৃত্যুহার এখনো ৩৩ এবং শিশু মৃত্যুহার (এক বছরের কম) প্রতি হাজার জীবিত শিশুর মধ্যে ২৭ জন।*** দেশের ১৮.৭ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং ৫.৬ শতাংশ লোক চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ভূমিহীন জনসংখ্যা ৩৫.৪ শতাংশ এবং ০.০৫ একরের কম ভূমির মালিক ৪৫.১ শতাংশ। এরূপ অবস্থায় বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. খাদ্যের যোগান: বাংলাদেশে খাদ্যের যোগান নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্য আমদানি এবং বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত খাদ্য সাহায্যের ওপর। গত তিন দশকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০/৮১ সালে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ১৪৯.৭ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। ১৯৯৫/৯৬ সালে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২৪.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩৭.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টনে। তথ্য উপাত্ত হতে বোঝা যায় বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন জরুরি বিষয়।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি

২. দারিদ্র্য প্রবণতা : বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি : খানা আয়-ব্যয় জরিপ : ২০২২

সন	বিভাগ অনুযায়ী								সার্বিক দারিদ্র্য	অতি দারিদ্র্য
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সলিট	বরিশাল	খুলনা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	রংপুর		
২০১৬	১৬%	১৮.৪%	১৬.২%	২৬.৫%	২৭.৫%	৩২.৮%	২৮:৯%	৪৭.২%	২৪.৩%	১২.৯%
২০২২	১৭.৯%	১৫.৮%	১৭.৪%	২৬.৯%	১৪.৮%	২৪.২%	১৬.৭%	২৪.৮%	১৮.৭%	৫.৬%

বিবিএস এর খানা আয় ব্যয় জরিপ-২০২২ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের মতো বিভাগওয়ারি দারিদ্র্যের চিত্রও পাল্টে গেছে। এখন সর্বোচ্চ দারিদ্র্যের হার রংপুরে নয়, বরিশাল বিভাগে। গত ছয় বছরে ঢাকা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। অন্যান্য বিভাগে দারিদ্র্যের হার কমেছে, অধিক কমেছে রংপুর, খুলনা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগে। দেশে বর্তমানে সার্বিক দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ যা ছয় বছর পূর্বে ২০১৬ সালে ছিল ২৪.৩ শতাংশ। অতি দরিদ্র্যের হারও এখন ৫.৬% যা ২০১৬ সালে ছিল ১২.৯ শতাংশ।

দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বিভাগে। অতি দারিদ্র্যের হিসাবে ঢাকার অবস্থান সবচেয়ে ভালো। মাত্র ২.৮ শতাংশ অতি দারিদ্র্যের বাস এ বিভাগে। গ্রামীণ অতি দারিদ্র্যও ঢাকায় সবচেয়ে কম, মাত্র ১.৯ শতাংশ। বরিশাল বিভাগে অতি দারিদ্র্যের হার ১১.৮ শতাংশ (জাতীয়ভাবে ৫.৬ শতাংশ)। অর্থাৎ বরিশালে অতি দারিদ্র্যের হার দেশের গড় দারিদ্র্যের হারের দ্বিগুণেরও বেশি। গ্রামীণ অতি দারিদ্র্যের হার জাতীয়ভাবে ৬.৫ শতাংশ। বরিশালে সর্বোচ্চ ১৩.১ শতাংশ, ঢাকা বিভাগে ১.৯ শতাংশ।

জাতীয় পর্যায়ে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ। গ্রামীণ দারিদ্র্যের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে খুলনা (১৬.২ শতাংশ)। রংপুরে নগর দারিদ্র্য সর্বোচ্চ ২৯.৯ শতাংশ, বরিশালে এ হার ২৮.৪ শতাংশ, জাতীয়ভাবে ১৪.৭ শতাংশ। নগর অতি দারিদ্র্যেও সর্বোচ্চ রংপুর বিভাগে (৩০.৫ শতাংশ), নগর অতি দারিদ্র্যে দ্বিতীয় ময়মনসিংহে (১৭.৬ শতাংশ, বরিশাল তৃতীয় (১৪.৫ শতাংশ)। নগর অতি দারিদ্র্যের জাতীয় হার ১২.৯ শতাংশ।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি

জমির মালিকানার ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা: বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৭০ হাজার হেক্টর কৃষিজমি কৃষিখাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। চাষযোগ্য জমি প্রতি বছর ১.২% হারে হ্রাস পাচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছে তারপরও দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সরবরাহ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।৩৩ ২০১০ সালের উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য পরিমাপে দেখা যায়, জনসংখ্যার ৩৫.৪ শতাংশ ভূমিহীন, ৪৫.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নিচে, ৩৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ২৫.৩ শতাংশের ০.০৫-১.৪৯ একর। নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দেখা যায় ২৭.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.৫ একরের নিচে, ১৭.৭ শতাংশ জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ১৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি

৩. খাদ্য ভোগ এবং স্বাস্থ্যবিধি: পূর্বে উল্লেখিত বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি এবং ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা দ্বারা বোঝা যায়, স্বাস্থ্যবিধি না মেনে শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্যও সকল মানুষের তিন বেলা খাবার সংস্থান হয় না। খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এ সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার হার বেশ উচ্চ। পুষ্টিহীনতার এ সমস্যা বাংলাদেশে দূর করা সম্ভব না হলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে না।

৪. শিক্ষা: এখনো দেশের ২২ শতাংশ জনগোষ্ঠী সাক্ষরতার বাইরে। মৌলিক শিক্ষা যা মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে এবং উচ্চ শিক্ষার হার আরও কম। শিক্ষার সাথে জীবনমান উন্নত করার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে সচেতন হতে পারেনি, তাই তারা খাদ্যের মান ও পুষ্টিগত গুণাবলি সম্পর্কেও সচেতন নয়।

৫. জলবায়ু পরিবর্তন: বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের দেশ বাংলাদেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন, পরিবেশ দূষণ, পানি সেচের সংকট, মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও হুমকির মুখে পড়তে পারে।

৬. বিবিধ কারণ: এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, দুর্বল গ্রামীণ অবকাঠামো, দ্রুত কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, কৃষি উৎপাদন বাড়লেও প্রতি বছর খাদ্য আমদানি করতে হয় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে। এছাড়া স্বল্প সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সিডর প্রভৃতির ফলে ভাসমান ছিন্নমূল মানুষের মিছিল বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ, দরিদ্র এবং ভূমিহীন প্রান্তিক চাষিদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও সংগ্রহের জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করা না হলে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার স্থায়ী অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৫ : খাদ্য নিরাপত্তা

টপিক – ০৪ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। খাদ্য নিরাপত্তার সাথে একটি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষিখাত সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে পড়ায় বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা বড় ঝুঁকির মুখে পড়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন দেশকে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো নিম্নরূপ:

১. নীতি প্রণয়ন: বিশ্বখাদ্য সম্মেলন ১৯৯৬ পরবর্তী সরকার এবং দাতাদেশ ও সংস্থা বাংলাদেশে খাদ্য নীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। সে লক্ষ্যে National Food Policy Plan of Action এবং Investment Plan for Food Security and Nutrition প্রণয়ন করা হয়। এতে সমন্বিতভাবে খাদ্য নিরাপত্তার সকল দিক (all Dimensions) যেমন খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা, উপযোগিতা বা ব্যবহার গুরুত্ব পায়। তিনটি মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে খাদ্য নীতি প্রণীত হয়। তা হলো-

ক. নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের পর্যাপ্ত ও স্থিতিশীল সরবরাহ।

খ. ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

গ. সবার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার। বিশেষত মহিলা ও শিশুদের জন্য অগ্রাধিকার।

২. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এর মেয়াদ শেষে জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ঘোষণা করেছে। এ সময়ের মধ্যে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্যকে (Targets) নিয়ে গঠিত SDG এর সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা অনুযায়ী চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক অসমতা দূরীকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের জন্য 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'আশ্রয়ন', 'গৃহায়ণ', আদর্শ গ্রাম', 'গুচ্ছ গ্রাম', 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলাভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে।

৩. দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি: আমরা জানি, দেশে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন না হলে আমদানি নির্ভরতার ওপর দাঁড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল হিসেবে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। এ লক্ষ্যে ইউরিয়া ব্যতীত সকল প্রকার সারের মূল্য অর্ধেকে কমিয়ে আনা, ভালো বীজ সহজলভ্য করা, ডিজেলের মূল্যে কৃষককে ভর্তুকি দেয়া, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, ব্যাংক ঋণ সহজ করাসহ কৃষিতে ভর্তুকি বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়। এতে কৃষকরা ফসল উৎপাদনে উৎসাহী হয়। সরকার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সাথে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার দিকেও লক্ষ্য রেখেছে। একই সাথে নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করছে।

৪. কৃষির সার্বিক উন্নয়ন: খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র সেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক কীটপতঙ্গ-রোগবালাই মুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প-সময়ে (Short-duration) ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণসহ সার্বিক কৃষি গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরমাণু ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্পসময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৬. ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের সহায়তা: দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবিমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ: শস্যবহুমুখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Endowment Fund গঠন করা হয়েছে। এছাড়া সরকার সারাদেশে কৃষাণীদের এবং কৃষকদেরকে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করেছে।

৮. কৃষিজমির আওতা সম্প্রসারণ: লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আবার স্বল্প সময়ের (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) শস্যের জাত চাষের ফলে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। এছাড়া জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষিজমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৯. অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ'। সরকার প্রতি বছরে কৃষকদের মূল্য সহায়তা ও খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ হয়েছিল ১৪.০৪ লক্ষ মে. টন এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০.৭৪ লক্ষ মে. টন।

১০. খাদ্যশস্য আমদানি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য চাহিদার একটি বিরাট অংশ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে, নীতিমালার মধ্য থেকে প্রতি বছর আমদানি করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সার্বিকভাবে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৭.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন (শুধু গম)।

পাঁচ বছরে খাদ্যশস্য আমদানির চিত্র:

অর্থবছর	২০১৩–১৪	২০১৪–১৫	২০১৫–১৬	২০১৬–১৭	২০২৩–২৪
চাল	৩.৭৫	১৪.৯০	২.৫৭	১.৩৩	০০
গম	২৬.৯১	৩৭.৮৪	৪৩.৬৬	৫৬.৯০	৩৭.৪৯
মোট	৩০.৬৬	৫২.৭৪	৪৬.২৩	৫৮.২৩	৩৭.৪৯

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি হলে বাংলাদেশকে চাল ও গম আমদানি বাড়াতে হয়, এর ফলে ডলারের দাম বাড়ে, বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ে।

১১. দুর্যোগ মোকাবেলা: বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে এ সময়ে দুর্গত মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের। এছাড়া রয়েছে মোট জনসংখ্যার ১২.১ ভাগ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং কৃষিখাতের বিপুল সংখ্যক মৌসুমি বেকার। এরূপ পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে সরকার। একই সাথে দুর্যোগ মোকাবেলা করে ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাপনার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

১২. খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ: খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সমাজের সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্য সহজে খাদ্য প্রাপ্তি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ কমে গেলে দাম বেড়ে যায়। অনেক সময় ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে অতি মুনাফার লোভে অস্বাভাবিকভাবে দাম বাড়িয়ে দেয়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সরকারকে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করতে হয়। এ কৌশল হিসেবে সরকার খোলাবাজারে চাল বিক্রি বা ওএমএস কর্মসূচি গ্রহণ করে। তবে ঢাকা ও আশেপাশের শ্রমঘন এলাকায় (নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, সাভার ও গাজীপুর) প্রায় সারাবছর এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। এর পাশাপাশি সুলভ মূল্য কার্ড বা ফেয়ার প্রাইজ কার্ডের মাধ্যমে প্রতি পরিবারকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল ও গম দেয়া হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচি ও ফেয়ার প্রাইজ কার্ডের মাধ্যমে ২০.৮৭ লাখ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩৩.৫০ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

১৩. মঙ্গা ও মৌসুমি দারিদ্র্য নিরসনে পদক্ষেপ: দেশের উত্তরাঞ্চল, উপকূলবর্তী এলাকা ও চরাঞ্চলসহ দেশের অনেক এলাকার বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠী বছরের দুটি সময়ে (মার্চ-এপ্রিল এবং অক্টোবর-নভেম্বর) হাতে কোনো কাজ থাকে না। আয়ের কোনো উৎস না থাকায় বাজারে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ থাকলেও তাদের পক্ষে তা কিনে খাওয়া সম্ভব হয় না। উত্তরাঞ্চলের এরূপ খাদ্যাভাবকে আধাদুর্ভিক্ষ বা মঙ্গা নামে পরিচিত। এরূপ খাদ্যাভাব দূর করতে 'অতি দরিদ্রদের জন্য ১০০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচি' নামে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো'-(ক) অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন।

এছাড়া মৌসুমি বেকারদের জন্য ৮০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প রয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে উত্তরাঞ্চলের . মঙ্গাপীড়িত ৫টি জেলা যথা: রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম এলাকায় কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা এসেছে।

১৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে ২০০৮ থেকে ২০১৫ মেয়াদি বাংলাদেশ ফুড পলিসি অ্যাকশন প্ল্যান (Bangladesh Food Policy Action Plan, 2008-2015) গ্রহণ করে। এর আলোকে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Bangladesh Food Security Country Investment Plan-CIP) প্রণয়ন করা হয়। দানাদার খাদ্যশস্যসহ পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। একই সাথে কৃষি ফসল, মৎস্য চাষ, পশু সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজার নিশ্চিতকরণসহ ১২টি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি প্রাক্কলন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

একটি আদর্শ পরিকল্পনা হিসেবে CIP ২০১০ সালের জুলাই মাসে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 'এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় খাদ্য নিরাপত্তা বিনিয়োগ ফোরাম' এ মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে এবং বাংলাদেশকে দৃষ্টান্তমূলক দেশ (Show Case Country) হিসেবে তুলে ধরা হয়।

একইভাবে অক্টোবর, ২০১০ সালে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটির ৩৬তম সভায় বাংলাদেশের 'খাদ্য নিরাপত্তা বিনিয়োগ পরিকল্পনা' অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ সুগম হয়। ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (GAFSP) থেকে ৩৭০ কোটি টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। ২০২২ সালে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে চরম খাদ্য সংকটের আশঙ্কার মধ্যে বৈশ্বিক জরুরি খাদ্য সহায়তায় বিশ্বব্যাপী প্রায় ৭০ কোটি ডলার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া ইইউ এবং জি-৭নেতৃবৃন্দও খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৫. নিম্ন আয় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য প্রাপ্তি কর্মসূচি: দেশের বিপুল সংখ্যক নিম্ন আয় ও দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ শ্রেণির (দরিদ্র, হতদরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য) জনগোষ্ঠীর জন্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করা বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার Futlic Food Distribution Systems) আওতায় নানা ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। এ সব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা। এর মধ্যে রয়েছে-১. দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা, ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), ২. দুর্যোগকালীন ত্রাণ হিসেবে দুর্গতদের জন্য খাদ্য সহায়তা দেয়া, গ্র্যাটিউইটাস রিলিফ (জিআর), ৩. খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রির (ওএমএস) মাধ্যমে-যেমন: ওএমএসে ১০ টাকা কেজি দরে চাল নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে রাজধানীর সাথে প্রত্যেক বিভাগীয় ও জেলা শহরে বিতরণ। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা, ৪. খাদ্যশস্যের বিনিময়ে গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন (টেস্ট রিলিফ-টিআর/কাজের বিনিময়ে খাদ্য-কাবিখা), ৫. ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচি ইত্যাদি। এছাড়াও সরকার-সারাদেশে ১ কোটি পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করেছে। ভবিষ্যতে বছরব্যাপী এ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।*

দেশের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের অবস্থার উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার সামাজিক উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেটে সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তায় ৪৩,৩২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। টেকসই দারিদ্র্যবিমোচনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল' (National Social Protection Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ এবং এ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করা সম্ভব হয়েছে।

১৬. খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্য মজুদ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নিরিখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পূর্বের ১৫ লাখ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্যগুদামের সাথে আরও সাত লাখ টন বাড়ানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ধারণক্ষমতা ৩০ লাখ টনে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সংগ্রহ করে এবং বিদেশ হতে আমদানি করে এ মজুত গড়ে তোলা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৫ : খাদ্য নিরাপত্তা

টপিক – ০৫ নিরাপদ খাদ্য

নিরাপদ খাদ্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নিরাপদ খাদ্য

নিরাপদ খাদ্য ধারণাটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরাপদ খাদ্য এরূপ একটি শর্ত বা নিশ্চিত অবস্থা বোঝায় যা ভোক্তার প্রত্যাশিত ব্যবহার বা খাবারের জন্য তাদের কোনোরূপ ক্ষতি হবে না। এ ধারণাটি খাদ্য উৎপাদন হতে ভোগ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে, যা খাদ্য গ্রহীতাকে এ সংক্রান্ত বিষয় হতে সর্বাত্মকভাবে নিরাপদ ও সুস্থ রাখবে। Environmental & Global health এ প্রসঙ্গে বলেন-It is the condition which ensures that food will not cause harm to the consumer when prepared and/or eaten according to their intended use.-internet.

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার জন্য নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণের সুপারিশ করেন-

১. নির্ধারিত তাপমাত্রা ও সময়ের মধ্যে খাদ্য রান্না বা প্রস্তুত করা যাতে খাদ্যে থাকা বিভিন্ন জীবাণু বা বিষের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়;

২. সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্যকে সংরক্ষণ করা;

৩. ভেজালমুক্ত খাদ্যের সাথে প্রয়োজনে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা,

৪. স্যাঁতস্যাঁতে এবং ঠাণ্ডা জায়গায় বা কাঁচা জিনিসপত্র হতে রান্নাকৃত খাদ্যকে পৃথক রাখা এবং

৫. স্বাস্থ্যবিধি বহির্ভূত মানুষের স্পর্শ, গৃহপালিত পশু-পাখি এবং বিষ হতে খাদ্যকে সুরক্ষা দেওয়া।

নিরাপদ খাদ্য

নিরাপদ খাদ্য বলতে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত, ভেজালমুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যকে বোঝায়। এরূপ খাদ্য বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধের শারীরিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম এবং অপার কর্ম উদ্দীপনা, উৎসাহের সঞ্চার করা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দান ও ক্ষণকালীন উপোসে ক্লান্তি ও দুর্বল বোধ না করে সুস্থ থাকাকে নির্দেশ করে।

বেশির ভাগ সময় আমাদের দেশে শহরে, বন্দরে, হোটেল, রেস্টুরেন্ট-এ যেসব খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয় তা নিম্নমানের, ক্ষতিকর, অকেজো ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মেশানো থাকে। অসাধু উৎপাদক, ব্যবসায়ীরা অতি মুনাফার লোভে বা অসাবধানতার কারণে এরূপ করে থাকে। ক্রেতাদের এ বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা না থাকলে আর্থিক, শারীরিক নানারূপ ঝুঁকি - নিতে হয়। ইদানিং শাক-সব্জি চাষাবাদের সময়ও নানারূপ বিষাক্ত কীটনাশক, রঙ্গিন ক্যামিকেল স্প্রে করা হয় যা রান্নার পরও নষ্ট হয় না। এরূপ বিষাক্ত ক্যামিকেল মেশানো খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল, রেস্তোরাঁয় পুরাতন নষ্ট অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে রান্না করা খাবার যেখানে সহস্র ক্ষতিকর অণুজীবের বংশবিস্তার ঘটে তা নিরাপদ বা স্বাস্থ্যবিধিসম্মত খাবার নয়।

সুতরাং খাদ্য দূষণ তিনভাবে হতে পারে। যেমন- ক্ষুদ্র অণুজীবের মিশ্রণে দূষণ, কীটনাশক বা রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে দূষণ এবং বালি, কাঁকর, কাচ, চুল, প্লাস্টিক, মৃত পতঙ্গ এরূপ মিশ্রণের ফলে শারীরিক দূষণ।

নিরাপদ খাদ্য

নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব: নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব বহুবিধ। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিত হলেই চলবে না তার সাথে নিরাপদ খাবার গ্রহণও জরুরি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. জনস্বাস্থ্য: আমরা সকলে জানি স্বাস্থ্যই সুখের মূল। নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ না করলে কর্মোদ্যম হ্রাস পায়, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। শরীর অসুস্থ হলে অনেক সময় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় যা সীমিত আয়ের পরিবারের জন্য একটি দুশ্চিন্তার বিষয়। অসুস্থতা অনেক সময় মৃত্যু ঝুঁকিও তৈরি করে। অসময়ে এরূপ মৃত্যু পরিবারের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বর্তমানে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত খাবার গ্রহণ না করার ফলে ক্যান্সার, হার্ট, লিভার, কিডনি, স্থূলতা প্রভৃতি জটিল রোগের বিস্তার সহজেই ঘটছে। এমনকি ডায়রিয়া, কলেরা, রক্তশূন্যতায়ও প্রচুর প্রাণহানি ঘটছে।

ভেজাল খাদ্য শিশুদের খুব দ্রুত আক্রান্ত করে। ডায়রিয়া, কলেরাসহ নানান ধরনের জটিল রোগে শিশুরা আক্রান্ত হয়ে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকরণেও নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি: ভেজাল খাদ্য গ্রহণের কারণে মানুষের শরীর ভালো থাকে না। অল্প বয়সেই অসুস্থ হয়ে যায়, উৎপাদিকা শক্তি, কর্মক্ষমতা এবং আয় হ্রাস পায়। সুতরাং উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাবার গ্রহণ জরুরি।

নিরাপদ খাদ্য

৩. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা ধারণার সাথে নিরাপদ খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধিসম্মত খাদ্য ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক।

৪. বাণিজ্যিক গুরুত্ব: মানুষ পূর্বাপেক্ষা অনেক সচেতন। মাছ, ফল, সবজিতে নানারূপ বিষাক্ত ক্যামিকেল মিশ্রণের কারণে অনেক ক্রেতা এরূপ ফল-সবজি ক্রয় করে না। এতে বিক্রেতার মুনাফা হ্রাস পায়। বিদেশে রপ্তানি ব্যাহত হয়, ফলে রপ্তানি আয়ও হ্রাস পায়।

৫. বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ: ভেজাল, বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ অল্প বয়সে বিভিন্ন কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং চিকিৎসার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের দ্বারা এরূপ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ করা যায়, স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

৬. প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব হতে মুক্ত: কৃষিতে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে হাইব্রিড বা উচ্চফলনশীল বীজ ও ফসলের মধ্যে জিনগত যে পরিবর্তন ঘটছে তা অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয় বরং জীবনহানিকর। নতুন নতুন রোগ-বালাই, পোকা-মাকড়, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে।

নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে করণীয়-

১. খাদ্য নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক অথবা দূষণমুক্ত উৎস হতে সুষম, পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ,

২. রোগ-ব্যাধি সৃষ্টিকারী জীবাণু (ঈস্ট, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া) ইত্যাদির হাত থেকে খাদ্যকে মুক্ত রাখা,

৩. স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্যকে সংরক্ষণ,

৪. মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য গ্রহণ না করা,

৫. খাদ্য সরবরাহকারীকে পরীক্ষার মাধ্যমে খাদ্যের গুণগতমান সম্পর্কে ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা বিধান করা, ভেজাল বা দূষণ প্রমাণে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের ঘোষণা বাস্তবায়ন করা;

খাদ্য পরিবেশনের সময় বিশুদ্ধ পানি দিয়ে পাত্র ও হাত পরিষ্কার করে স্বাস্থ্যকরভাবে খাবার পরিবেশন করা,

৬. ৭. সরকারিভাবে তদারকি সংস্থা BSTI (Bangladesh Standard and Testing Institution) এর সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট এর সমন্বয়ে হঠাৎ হঠাৎ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দোষীদের শাস্তি প্রদান করা এবং

৮. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এ সম্পর্কিত বিধি, উপবিধি যথাযথ অনুসরণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৫ : খাদ্য নিরাপত্তা

টপিক – ০৫ নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য নিরাপদকরণে সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও জনসাধারণের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

খাদ্য নিরাপদকরণে সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও জনসাধারণের ভূমিকা

সুন্দর জীবন, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও সুস্থ জাতিগঠনে নিরাপদ খাদ্য আবশ্যক। ভেজালমুক্ত, বিষাক্ত রাসায়নিক কীটনাশকমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি উপযুক্ত পুষ্টি মানসম্পন্ন ঘরোয়া বা বাণিজ্যিক, নিরাপদ খাদ্য শিশু-বৃদ্ধ সবার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে সুশিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষ ভোক্তা যেমন সচেতন নয়, তেমনি অতি মুনাফালোভী, অসৎ উৎপাদক, ব্যবসায়ী যেনতেনভাবে অস্বাস্থ্যকর, জীবনের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর পণ্য-সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য বাজারজাত করছে। মানুষ অসচেতন বা উপায়হীন হয়ে উক্ত পণ্যদ্রব্য, খাদ্য ভোগে বাধ্য হচ্ছে। এতে ভোক্তার জীবন মারাত্মক হুমকির মুখোমুখী। ভবিষ্যতের সম্পদ শিশুস্বাস্থ্য বিপন্ন। এখনি সময়, সবাইকে যার যার অবস্থান হতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার, বেসরকারি সংস্থা (NGOs) এবং জনসাধারণ সবার ভূমিকা রয়েছে।

সরকারের ভূমিকা': নিরাপদ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার Consumer Protection Act এবং Food Act সহ বিভিন্ন আইন প্রণয়নের কাজ বাস্তবায়ন করছে। যেমন:

(i) খাদ্য উৎপাদন, বিপণন, বণ্টনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। সে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং অমান্যকারীর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত ও দৃশ্যমান করতে হবে। যেমন-জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল খাদ্যদূরীকরণে 'মোবাইল কোর্ট অভিযান' সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছিল।

(ii) নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে খাদ্য সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। এ কারণে সরকার The Pure Food Ordinance 1959. Fish Protection and Conservation Act 1950 (সংশোধন ১৯৯৭); BSTI (Bangladesh Standard and Testing Institution) Amendment Act-2003 সংশোধন করেছে। খাদ্যে ভেজাল রোধে সরকার কঠোর এবং অজামিনযোগ্য শাস্তির বিধান সম্বলিত 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' পাস করেছে। এ আইনে খাদ্যে ভেজালের জন্য ৫ বছরের কারাদণ্ড ও ২০ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

এ আইন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হতে কার্যকর হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, আইনটির মৌলিক বিষয়সমূহের ওপর সম্যক ধারণা ও সঠিক প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ নিরাপত্তা খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয় করবে। সমগ্র দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সকল খাদ্য ও খাদ্য উপাদান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন ও তা অনুশীলনে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমাধান প্রভৃতি কার্যক্রম 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর ২ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২০১৮ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

(iii) জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য টেলিভিশন, পত্রিকার মাধ্যমে এবং পাঠ্যবই-এর সিলেবাসে সংযুক্ত করে প্রচারের উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক। ইতোমধ্যে জাতীয় দৈনিকে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ ও এর অধীনে প্রকাশিত বিধি/প্রবিধিমালা সম্পর্কে জনগণ ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের জ্ঞাতার্থে 'গণবিজ্ঞপ্তি' প্রকাশিত হচ্ছে।

(iv) মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি স্তরে মান যাচাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত দুর্নীতিমুক্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে হবে।

(v) জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তারা স্বেচ্ছায় অস্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপাদন বা পরিবেশন সম্পর্কে সরকারের 'তথ্য প্রদান কেন্দ্র' এ তথ্য দিয়ে সহায়তা করে।

(vi) সরকারি উদ্যোগে খাদ্যের গুণগতমান আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নিরূপণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। খাদ্যের উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা হলে বিশ্বাসযোগ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়।

(vii) নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। উৎপাদিত বা সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান যাচাইকরণ, কারখানায় নজরদারি বাড়ানো, ফরমালিন, রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও কেমিক্যালযুক্ত ভেজাল ক্ষতিকর, অবশিষ্টাংশ খাদ্যদ্রব্য যাতে বিক্রি করতে না পারে সেজন্য সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(viii). ইতোমধ্যে সরকার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করেছে, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জোটে সদস্য হিসেবে যোগ দিচ্ছে। এর ফলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহে বৈশ্বিক উদ্যোগের সাথে একসঙ্গে বাংলাদেশও চলতে পারবে।

(ix) মানবসম্পদ উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু সীমিত সম্পদ দ্বারা রাষ্ট্র একা এ কাজটি করতে পারে না। তাই সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যৌথ উদ্যোগে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণে সক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা এবং জীবনমান উন্নয়নে সরকারের গৃহীত নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্য সংগ্রহের ক্রয়ক্ষমতা ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছানো যাবে না।

বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা: সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ (Non-Government Organization-NGO,) খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদকরণে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখছে। এসব বেসরকারি সংস্থার (NGOs) বিস্তৃতি গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিদ্যমান। সকল শ্রেণির উৎপাদক, সরবরাহকারীর সাথে কোনো না কোনো পর্যায়ে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। আবার দরিদ্র ভোক্তা শ্রেণির সাথেও রয়েছে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। তাই বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক হিসেবে খাদ্য নিরাপদকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। ভোক্তাদের অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনকারী সংস্থা হলো-কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (CAB)। এছাড়াও দশের বাংলাদেশ (DOSHER Bangladesh) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (BAPA) ইত্যাদি বেসরকারি সংস্থাসমূহ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে দৃশ্যমানভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ এ সম্পর্কিত কঠোর আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অবদান রাখছে। বেসরকারি সংস্থাসমূহ খাদ্য নিরাপদকরণে যেসব ভূমিকা পালন করছে, তা হলো:

(i) খাদ্যে ভেজাল বিরোধী প্রচারণা, ভোক্তা অধিকার আইন বাস্তবায়নে কর্মসূচি পালন, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি দাবি জানানো ইত্যাদি;

(ii) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান। দরিদ্র, দুঃস্থ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন;
(iii) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, হতদরিদ্র বস্তিবাসী-চরবাসী, দুঃস্থ নারী এবং দরিদ্র বেকারদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
(iv) দরিদ্র, অবহেলিত এবং অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ;
(v) দরিদ্র ও অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে আয়বর্ধক কর্মসূচি। যেমন: শাক্-সবজি চাষ; গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন; কুটিরশিল্প স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনসহ সস্তায় কৃষি বীজ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং সামাজিক বনায়নে অবদান রাখছে।

জনসাধারণের ভূমিকা: খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বা খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত উন্নত বা ধনীদেশসমূহে যেখানে জনগণ শিক্ষিত, সচেতন, দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক, সেখানে জনসাধারণ খাদ্যের ভেজাল প্রতিরোধে শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণ অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত, ভাগ্যে বিশ্বাসী, অলস, অসচেতন। তাই এ সকল দেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে জনগণের কণ্ঠস্বর থাকে দুর্বল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। দরিদ্র দেশে জনগণের এই অসচেতনতাকে পুঁজি করে অতিমুনাফালোভী, অসৎ ব্যবসায়ীরা 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হয়ে যেতে চায় রাতারাতি। জনসাধারণের মধ্যে যারা শিক্ষিত সচেতন, তারা দরিদ্র অশিক্ষিতদের মাঝে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। তাদেরকে মনে রাখতে হবে, সমাজে একজন শিক্ষিত ব্যক্তির দায়িত্ব অন্যদের তুলনায় অনেক বিস্তৃত বা ব্যাপক।

খাদ্যে ভেজাল: বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র-

বাংলাদেশ প্রায় ১৭ কোটি লোকসংখ্যা, যাদের বেশির ভাগ অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত। আবাদযোগ্য জমি প্রতি বছর বসবাসের জন্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণে উৎপাদক কৃষক চাষিরা হিমসিম খাচ্ছে। ব্যাপক চাহিদার কারণে কৃষকরা যেকোনোভাবে যেকোনো উপায়ে দ্রুত উৎপাদন করে বাজারজাত করলেই লাভবান হতে পারে। খাদ্যের যোগানই যেখানে অনেক সমস্যা সেখানে মান নির্ধারণ বা মান ভালো-মন্দ পার্থক্য নির্ণয় করা অনেকের নিকট অপ্রাসঙ্গিক। কৃষকরা দ্রুত উৎপাদনের লক্ষ্যে জমিতে বিষাক্ত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করছে। ফলমূল পাকানোর জন্য কার্বাইডসহ অন্যান্য বিষাক্ত কেমিক্যাল, পচনরোধ করার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করছে। ফল, শাক-সবজি, মাছ-তরকারি কোনো খাদ্যদ্রব্যই ভেজালমুক্ত নয়। শহরে বন্দরে হোটেল-রেস্তোরাঁয় যেখানে খাবার রান্না করা হয় এবং যারা খাবার রান্না করেন বা পরিবেশন করেন সর্বত্রই অস্বাস্থ্যকর, বিপজ্জনক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এরূপ প্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে খাদ্য নিরাপদকরণে সরকার ও বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি জনসাধারণেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন:

খাদ্য নিরাপদকরণে সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও জনসাধারণের ভূমিকা

১. শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ: সমাজে যারা শিক্ষিত তাদেরকেই প্রথমে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একজন শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি প্রতি মাসে ২০/৩০ জন কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকজনকে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। নিরাপদ খাবার গ্রহণের দ্বারা মানুষ সুস্থ থাকতে পারে-এ ধারণা সম্যকভাবে বোঝাতে হবে। একই সাথে খাদ্যে কারা ভেজাল মিশাচ্ছে তারও ধারণা দিতে হবে।

২. জনসচেতনতা সৃষ্টি: পাড়া-মহল্লায় টেবিল বৈঠক, সাধারণ আলোচনা, পত্রিকায় লেখালেখি, টেলিভিশনে আলোচনা, নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন, নাটক মঞ্চায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩. উৎপাদনক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা: খাদ্য প্রস্তুতের প্রথম ঘর হলো কৃষকদের ঘর। সুতরাং প্রথমে কৃষকদের মাঝে খাদ্যে ভেজাল বিরোধী প্রচার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। কৃষকদেরকে শুধুমাত্র জৈব সার এবং প্রাকৃতিক নিধনমূলকব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে Organic food প্রস্তুত বা উৎপাদনে উৎসাহিত করতে হবে।

৪. হোটেল-রেস্তোরাঁ ও ভাসমান খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্রে নজরদারি প্রত্যেক এলাকায় হোটেল-রেস্তোরাঁ ও ভাসমান খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্রে খাদ্যদ্রব্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে কিনা তা স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করে নজরদারি বা তদারকি করা প্রয়োজন। কমিটির ঘোষিত নিয়ম-কানুন যারা পালন করবে না তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া উচিত।

৫. হাট-বাজারে তদারকি: হাট-বাজারে ফল-মূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস বিক্রেতাদেরকে বিক্রয়কৃত সামগ্রী নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে, দায়িত্ব নিয়ে বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ করা বা বাধ্য করা উচিত।

৬. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে বাধ্য করা: ভেজাল খাদ্য বিরোধী তীব্র জনসচেতনতা সৃষ্টি করে এর উৎপাদন, বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর আইন প্রণয়নে এবং আইন প্রয়োগে বাধ্য করার জন্য তীব্র গণআন্দোলনের ন্যায় চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

৭. ভেজাল বিরোধী অভিযান: জনসাধারণকে বিভিন্ন ভোক্তা-অধিকার সংগঠনগুলোর ব্যানারে সংগঠিত হয়ে হাট- বাজারে ভেজাল বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে, প্রশাসনকে দিয়ে অভিযান পরিচালনা করে ফল দোকান, খাবার দোকান, মাছ-সবজির দোকান, শিশু খাদ্য সর্বত্রই মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে হঠাৎ হঠাৎ নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। দোষীদের বৃহৎ জরিমানা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. গণমাধ্যমে প্রচার: ভোক্তা অধিকার সংগঠনগুলো নিজেরা চাঁদা তুলে ভেজাল খাদ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করে জনগণকে সচেতন করতে পারে।

৯. ভেজাল খাদ্য বর্জন সচেতন জনগণ নিজেও ভেজাল খাদ্য বর্জন করবে, অন্যকেও ভেজাল খাদ্য ক্রয়ে নিরুৎসাহিত করলে, চাহিদা হ্রাস পাবে। এভাবে একসময়ে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য বিক্রি শুরু হবে ও ভালো খাবারের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

১০. সামাজিক আন্দোলন জনগণই পারে ভেজাল খাদ্য বিরোধী কর্মকাণ্ডকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তর করতে। এরূপ আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে শুভ উদ্যোগের সূচনা হয়। নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধিসম্মত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে উদ্যমী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উন্নত সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে জাতি সমৃদ্ধ হয়।

উপরের আলোচনা হতে বোঝা যায়, সরকারি বেসরকারি সংস্থার তুলনায় জনসাধারণই ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৫ : খাদ্য নিরাপত্তা

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. নিরাপদ খাদ্য বলতে কী বোঝায়?[আলিম '১৯]
(ক) দামি খাদ্য (খ) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য
(গ) বিদেশি খাদ্য (ঘ) ফরমালিনযুক্ত খাদ্য

২. অপুষ্টির কারণে সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ এলাকায় খর্বকায় শিশুর হার কত?
(ক) ২৫% (খ) ১৮% (গ) ৭% (ঘ) ৪%

৩. অপুষ্টির কারণে সিটি কর্পোরেশনের বস্তি এলাকায় ৫ বছরের নিচে কম ওজনের শিশুর হার কত?
(ক) ৪০% (খ) ৩১% (গ) ১২% (ঘ) ৩%

৪. বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী খর্বাকৃতির শিশুর হার কত?
(ক) ৪৫% (খ) ৪০% (গ) ৩৬.১% (ঘ) ২৫%

৫. বাংলাদেশের কোন জেলায় দারিদ্র্যের হার সর্বনিম্ন?
(ক) ঢাকা (খ) বান্দরবান (গ) মুন্সিগঞ্জ (ঘ) নারায়ণগঞ্জ

৬. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? [য. বো. '১৬]
(ক) খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়ক্ষমতা (খ) খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা
(গ) খাদ্য রপ্তানি আয় (ঘ) খাদ্য আমদানি হ্রাস

৭. খাদ্য প্রাপ্তি ও আয় স্তরের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থাকে বলে-[চ. বো. '১৯)
(ক) খাদ্যের পর্যাপ্ততা (খ) খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা
(গ) খাদ্যের নিরাপত্তা (ঘ) খাদ্যের স্থিতিশীলতা

৮. খাদ্যের দামস্তর নাগালের মধ্য থেকে পর্যাপ্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিকে বলে-[চ. বো. '১৯]
(ক) খাদ্যের পর্যাপ্ততা (খ) খাদ্যের প্রাপ্যতা
(গ) খাদ্যের নিরাপত্তা (ঘ) খাদ্যের স্থিতিশীলতা

৯. খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়-[কু. বো. '১৯]
(ক) মৌলিক খাদ্যের প্রাপ্যতা (খ) অধিক ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের প্রাপ্যতা
(গ) সস্তা খাবারের প্রাপ্যতা (ঘ) বৈচিত্র্যময় খাদ্যের প্রাপ্যতা

১০. খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমস্যা কোনটি? [য. বো. '১৯]
(ক) খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি (খ) বিনিয়োগ বৃদ্ধি
(গ) জ্বালানির মূল্য হ্রাস (ঘ) জনসংখ্যা হ্রাস

১১. কেয়ার কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?
(ক) একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (খ) একটি বেসরকারি সংস্থা
(গ) একটি বেসরকারি সংস্থা (ঘ) একটি উন্নয়ন ব্যাংক

১২. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায়-
(ক) খাদ্যের যোগান (খ) একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানি
(গ) বৈচিত্র্যময় খাদ্য উৎপাদন (ঘ) খাদ্যের গুণাগুণ

১৩. খাদ্যের চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা যোগানের পরিমাণ বেশি হলে নিচের কোন বিষয়টি অর্জন করা সম্ভব হয়?
(ক) খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা (খ) খাদ্যের প্রাপ্যতা
(গ) খাদ্যের মান (ঘ) খাদ্যের ব্যবহার

১৪. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কোনটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা?
(ক) খাদ্য উৎপাদন (খ) খাদ্য আমদানি
(গ) খাদ্য বণ্টন (ঘ) খাদ্য সংরক্ষণ

১৫. খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, মান নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম-[কু. বো. '১৭]
(ক) বিএসটিপি (খ) টিসিবি (গ) বিএসটিআই (ঘ) ক্যাব

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৫ : খাদ্য নিরাপত্তা

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রুমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে একটি সেমিনার থেকে জানতে পারে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও খাদ্য ঘাটতির দেশ। খাদ্যের জন্য প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে। এ লক্ষ্যে সার, কীটনাশক ও অন্যান্য উপকরণে ভর্তুকি দিচ্ছে। আশার কথা হলো বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং খাদ্য ঘাটতি কমছে।[রা. বো. '১৯]

ক. উফশি প্রযুক্তি কী?

খ. বাংলাদেশে খাদ্য-নিরাপত্তা অর্জনের সম্ভাবনা কতটুকু?

গ. বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণে সরকারের পদক্ষেপসমূহ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. খাদ্যে দ্রুত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারের কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? উদ্দীপকের ভিত্তিতে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

২০১২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বখাদ্য নিরাপত্তা সূচকে ১০৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম, দক্ষিণ এশিয়াতে নিচের দিক থেকে দ্বিতীয়। ২৫টি নির্ণায়কের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত রিপোর্ট মূলত তিনটি উপাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে-সামর্থ্য অবস্থান ৭৮, প্রাপ্যতা অবস্থান ৮১, গুণগত মান ও নিরাপত্তা অবস্থান ৯২। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন-খাদ্যনীতি প্রণয়ন, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য মজুদ বৃদ্ধি, খাদ্য আমদানি ও খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি। [কু. বো. '১৯]

ক. খাদ্যের উপযোগিতা কী?

খ. "জনসচেতনতা সৃষ্টি ব্যতীত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়"-ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ কি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

- গত বছর মিয়ানমার থেকে প্রায় নয় লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সুযোগে ফল, মাছ, মাংসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ভালো রাখতে এবং পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে অসাধু ব্যবসায়ীগণ এক ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করেন। জনসাধারণ না বুঝেই ভেজাল খাদ্য ক্রয় করেন। [দি. বো. '১৯]

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী?

খ. নিরাপদ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. উদ্দীপকে অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম কীভাবে নিরাপদ খাদ্যের কার্যকারিতা ধ্বংস করছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যার আলোকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো তা বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU